পতিসরে রবীন্দ্রনাথ

সালাম আজাদ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বাংলাদেশের একটি অনগ্রসর এলাকার নাম পতিসর। সেখানে আজো পৌঁছেনি বিজলি বাতির আলো। বর্ষাকালে যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। অন্য সময় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হয় মাইলের পর মাইল। পতিসর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এখনো দূরত্ব হিসেব করে 'ক্রোশ' দিয়ে। মাইলে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অথচ দেশে চলছে এখন কিলোমিটারের হিসেব। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে অবহেলিত, অনগ্রসর, এই পতিসর রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠেছিল।

মূলত জমিদারি তদারকির কাজে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে পতিসর আসেন। কালীগ্রাম পরগণা, যার সদর কাছারি পতিসর। কখনো শিলাইদহ থেকে, কখনো সাহাজাদপুর বসে, আবার কখনো পতিসরে অবস্থান করে কালীগ্রাম পরগনার জমিদারির কাজ পরিচালনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবে একটানা দীর্ঘ দশ বছর তিনি পতিসরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এরপর ফিরে যান কলকাতায়, শান্তিনিকেতনে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রদের মধ্যে সর্বশেষ জমিদারি ভাগাভাগির পরেও কালীগ্রাম পরগণা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাগে থেকে যায়। তাঁর পক্ষে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দেখাশুনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ আসতেন মাঝে মধ্যে। ১৯৩৭ সালে তিনি সর্বশেষ বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এসেছিলেন এবং তা পতিসরে।

কালীগ্রাম পরগনার প্রজাদের থেকে খাজনা তুলে অন্যান্য জমিদারদের মতো কলকাতায় বসে তিনি বিলাসী জীবনযাপন করেন নি। প্রজাদের কল্যাণে তিনি বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। আত্রাই থেকে পতিসর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আট মাইল রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন প্রজাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে। পানীয় জলের জন্যে পরগণার বিভিন্ন জায়গায় কূপ খনন করে দিয়েছেন। প্রজাদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করেছেন। মহাজনদের চড়া সুদের ছোবল থেকে প্রজাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন। নোবেল প্রাইজের অর্থ থেকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এই ব্যাংকে রেখে তা থেকে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করেছেন। যদিও সে টাকা আর ব্যাংকে ফেরত আসেনি।

রবীন্দ্রস্পর্শধন্য এই পতিসর দেখার আগ্রহ দীর্ঘকালের। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ব্রাকের প্রকাশনা ব্যবস্থাপক ডঃ জয়া সেনগুপ্তার উৎসাহে আগস্ট '৯৬ তে পতিসর যাবার সুযোগ এসে যায়। দুর্গম পথ অতিক্রম করে পতিসরে পৌঁছে কিছুটা হতাশ হয়ে যাই। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির মতো কিংবা সাহাজাদপুরের কাছারি বাড়ির সঙ্গে পতিসরের কাছারি বাড়ির কোনো তুলনাই করা সম্ভব নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কোনো আসবাবপত্র কিংবা পাণ্ডুলিপির অনুপস্থিতি আমাকে আরো বেশি হতাশ করে। তবে রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটের বৃদ্ধ কর্মী কনকবাবুর কাছে প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কিছু চিঠি, যা তিনি সযতনে সংরক্ষণ করে আসছেন অনেক কাল থেকে, আমাকে আনন্দ দেয়।

পতিসর থেকে ফিরে এসে 'পতিসরে রবীন্দ্রনাথ' — এ শিরোনামে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করার আগ্রহ বোধ করি। পাণ্ডুলিপি লেখার প্রয়োজনে রেফারেন্স বই হাতড়ে বেড়াই। কিন্তু হতাশ হই। রবীন্দ্রনাথের পতিসরের জীবন নিয়ে কোনো বই আজও লেখা হয়নি। ফলে বিভিন্ন তথ্যের জন্যে আমাকে যোগাযোগ করতে হয় বিদগ্ধ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে। সাহায্য নিতে হয় রবীন্দ্ররচনাবলী, ছিন্নপত্রাবলী, ছিন্নপত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের। গোলাম মুরশিদের 'রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ/পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা' বইটি 'রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ' পরিচ্ছেদটি লিখতে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে ডঃ জয়া সেনগুপ্তাকে বিনীত ধন্যবাদ জানাই। তাঁর উৎসাহ না পেলে আমার হয়তো পতিসর যাওয়া হতো না এবং পতিসর যাওয়া না হলে এই বই লেখার আগ্রহ জাগত না।

পতিসর, কালীগ্রাম থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি ছিন্নপত্রাবলী এবং ছিন্নপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর চিঠিগুলি কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের কর্মী কনকবাবু ও ফারুক বখ্‌তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ ও ঋণী করেছেন।

এ গ্রন্থের ত্রুটির সমস্ত দায় আমার। রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকদের যদি বইটি ভালো লাগে তাহলে আমার এই সামান্য পরিশ্রমকে সার্থক মনে করব।

ঢাকা
জুলাই, ২০০২

সালাম আজাদ

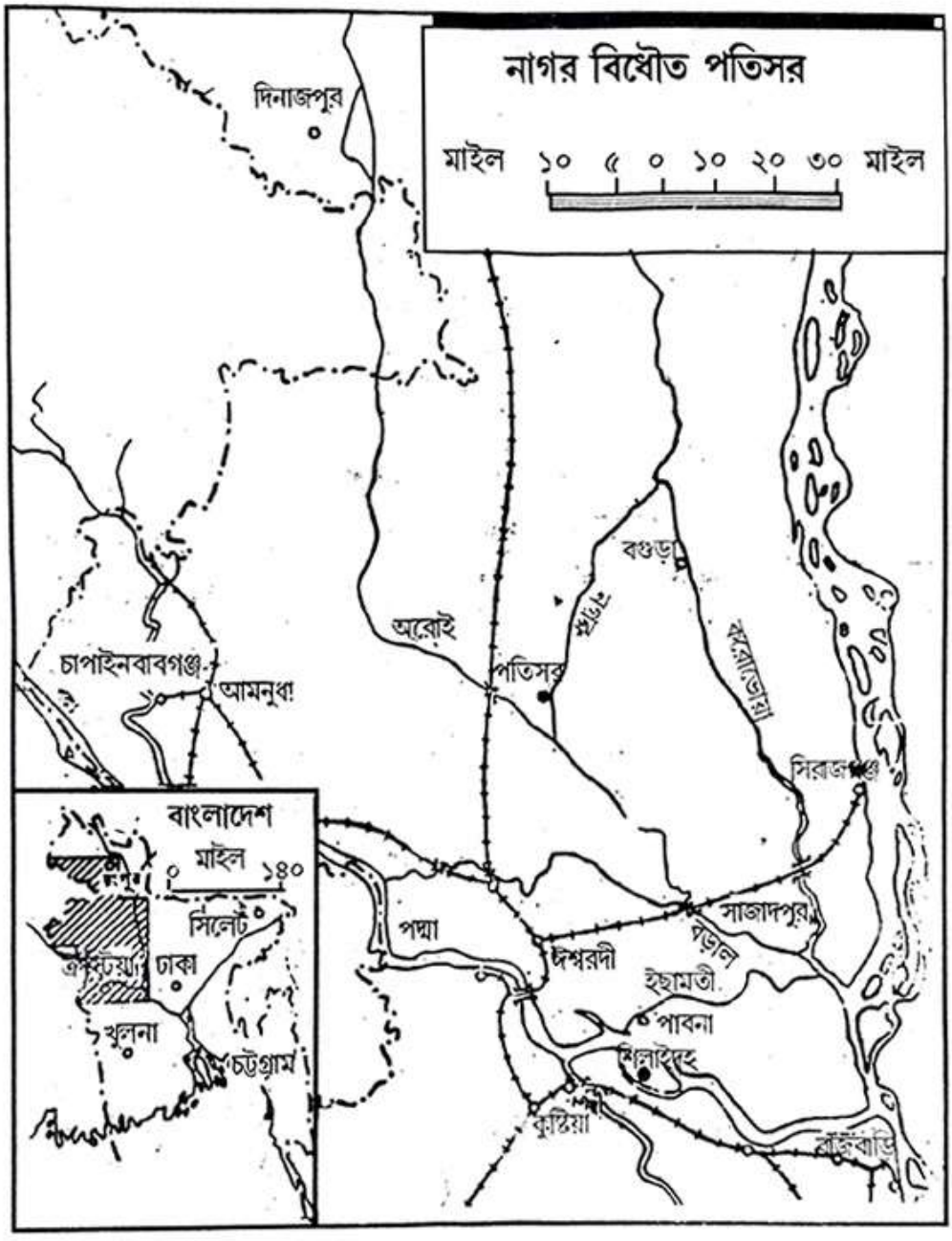

পতিসর ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানচিত্র

সূচীপত্র

- ঠাকুর পরিবার ও পতিসর ১৩
- রবীন্দ্রনাথের পতিসর ১৮
- আধুনিক কালের পতিসর ২৪
- পতিসরে রবীন্দ্র-রচনা ২৬
- পতিসরে রচিত কিছু গান ২৭
- রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ ৩২
- পরিশিষ্ট-১ ৪৩
- পরিশিষ্ট-২ ৬৮
- নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থতালিকা ৯৪
- পত্র-পত্রিকা ৯৬

ঠাকুর পরিবার ও পতিসর

যশোর (বর্তমান খুলনা) জেলার ফুলতলা থানার পিঠাভোগ গ্রামের পিরালি ব্রাহ্মণ পঞ্চানন কুশারী জীবিকার প্রয়োজনে কলকাতার নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। তখন ইংরেজদের বাণিজ্যতরী গোবিন্দপুরের গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়ত। পঞ্চানন কুশারী এসব জাহাজের মালপত্র নামানো-উঠানোর ঠিকাদারী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই কাজে তিনি স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করতেন। এসব শ্রমিকরা পঞ্চানন কুশারীকে 'ঠাকুরমশায়' বলে সম্বোধন করত। ক্রমে পঞ্চানন কুশারী জাহাজের কাপ্তেনদের কাছেও পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিগণিত হন। ইংরেজ কাপ্তেনদের কাগজপত্রেও Tagore লেখা হতে লাগল। ফলে পঞ্চানন কুশারী ধীরে ধীরে পঞ্চানন ঠাকুর নামে অভিহিত হলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ, ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ্য, পঞ্চানন কুশারীর আদিপুরুষ যশোর জেলার (বর্তমান খুলনা জেলা) জগন্নাথ কুশারী।

পঞ্চানন কুশারীর পঞ্চানন ঠাকুরে পরিবর্তনের আরো একটি অভিমত হচ্ছে গঙ্গার ঘাটে তিনি পূজা আর্চা করতেন বলেই তাঁকে ঠাকুরমশাই বা ঠাকুর সম্বোধন করা হতো। পঞ্চানন ঠাকুরের পুত্র জয়রাম ঠাকুর ইংরেজ সরকারের আমিন পদে চাকরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জয়রাম ঠাকুরের পুত্র নীলমণি ঠাকুর কলকাতার মেছুয়াবাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৮৪ সালের জুন মাস থেকে নীলমণি ঠাকুর মেছুয়াবাজার এলাকায় সপরিবারে বসবাস শুরু করেন।

নীলমণি ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামলোচন ঠাকুর বিভিন্ন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পুত্রহীন রামলোচন দত্তক গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে রামলোচন ঠাকুর তাঁর তের বছরের পালিত পুত্রকে বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি ১৮০৭ সালে উইল করে দিয়ে যান। ১৮৩০ সালে কালীগ্রাম পরগনা ১৮৩৪ সনে সাহাজাদপুরের জমিদারি দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে ক্রয় করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে ম্যাকিনটস কোম্পানির গোমস্তা হিসাবে রেশম ও নীল ক্রয়ে সাহায্য করতেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে জমিদারির স্বত্ব এবং রাজস্ব বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ও নিমকমহলের প্রধান Mr. Plowden-এর দেওয়ান হিসেবে ১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ যোগদান করেন। তিনি ১৮২৮ সালে ম্যাকিনটস কোম্পানির একজন অংশীদারে পরিণত হন এবং উক্ত কোম্পানির পরিচালিত কমার্শিয়াল ব্যাংকের একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮২৯ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর Customs Solt and opium Board-এর

দেওয়ান নিযুক্ত হলে তাঁর আরো একধাপ অগ্রগতি হয়। এ বছর পয়লা আগস্ট ইউনিয়ন ব্যাংক নামে একটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি দেওয়ান পদে কর্মরত থাকার কারণে তিনি প্রকাশ্যে এ ব্যাংকে যোগদান না করলেও নেপথ্যে দ্বারকানাথ ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাংকের কর্ণধার। স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সরকারি দেওয়ান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কিছুদিন পরেই Carr Tagore & Co. নামে একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। দেশীয় কোনো নাগরিক দ্বারা ইউরোপীয় আদর্শে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত এটাই প্রথম বাণিজ্যকুঠি। নিজের মেধা ও শ্রমের দ্বারা ১৮৩৭-৩৮ সালের মধ্যেই দ্বারকানাথ ঠাকুর অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন। দ্বারকানাথের সময়টিই ঠাকুর পরিবারের ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের গগনস্পর্শী সময়। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথের প্রথমবার বিলেত যাত্রার সময় তাঁর বিষয়-সম্পত্তির একটি মোটামুটি হিসেব দিয়েছেন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়।'[১]

কিন্তু ঠাকুর পরিবারের এই সম্পদের স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল হয়নি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলেই পতনের সূত্রপাত শুরু হয়। ১৮৩৩ সালে কমার্শিয়াল ব্যাংকসহ ম্যাকিনটস কোম্পানির পতন হয় এবং ব্যাংকের সমস্ত দায় দ্বারকানাথকে পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতে হয়। ১৮৪৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইউনিয়ন ব্যাংকেরও পতন ঘটে। ১৮৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি কার-ঠাকুর কোম্পানিরও পতন হয়। এ সময় রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের দাম পড়ে যায় এবং এদেশীয় নীলব্যবসা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ রয়েছে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'আমার প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগাধ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বিলাতে তাঁর যখন মৃত্যু হল দেখা গেল ব্যবসাক্ষেত্রে দেনাও অগাধ রেখে গেছেন তিনি। মহর্ষি তখন বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে সমস্ত দেনা শোধ করলেন। তৎসত্ত্বেও যা থাকল তা নিতান্ত সামান্য নয়। উড়িষ্যার তিনটি জমিদারি, পাবনায় সাহাজাদপুর, রাজশাহীতে কালীগ্রাম ও নদীয়াতে বিরাহিমপুর এই কয়েকটা সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত তাঁর রয়ে গেল।'[২]

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৮৫

২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৩১

দ্বারকানাথ ঠাকুরের চরিত্রের অন্যতম দু'টি দিক ছিল বিলাসিতা এবং মুক্তহস্তে দানশীলতা। তাঁর বিলাসবহুল জীবন ও উদার দান-খয়রাতের কারণেই ঠাকুর পরিবারে অকালে সম্পদের টান পড়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিষ্ঠা, সততা, ও সংযমী জীবনযাপনের মাধ্যমে পিতার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর অপর দুই পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ যথাক্রমে চৌত্রিশ এবং ঊনত্রিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করায় পিতার সমস্ত ঋণ জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকেই পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতে হয়। দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী স্বামীর এই অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা কখনোই মেনে নেননি।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর যে সমস্ত ঋণ তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিশোধ করতে হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত ঋণ, হৌসের ঋণ, উইলে প্রতিশ্রুত দানের ঋণ। দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে সে সময়ে কলকাতার প্রভূত ধনবান রায়দুলাল সরকারের উত্তরসূরিগণ, জয়রাম মিত্র, রাজচন্দ্র দাস (মাড়), রানী কাত্যায়নী (পাইকপাড়া), কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অনেক সময় বিনালেখাপড়াতেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ঋণ দিতেন। এইসব অলিখিত ঋণও মহর্ষিকে পরিশোধ করতে হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে এসব ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের ঋণ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমাদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা। ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান।'[৩] মৃত্যুর পূর্বে ১৮৪০ সালের ২০ আগস্ট (৬ ভাদ্র ১২৪৭) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ট্রাস্টডীড করে কিছু সম্পত্তি আলাদা করে রেখেছিলেন। এই ট্রাস্টডীড দ্বারকানাথের সন্তানরা ভোগ করতে পেরেছিলেন। ট্রাস্টডীডভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে ছিল নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনা, রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা, পাবনা জেলার সাহাজাদপুর পরগনা এবং ওড়িশার পান্ডুয়া ও বালিয়ার কিছু জমিদারি। পিতৃঋণ পরিশোধ করার প্রয়োজনে দেবেন্দ্রনাথ পিতার অধিকাংশ সম্পত্তি বিক্রি করার পরেও যে পরিমাণ সম্পত্তি থেকে গেল তা তৎকালীন বাংলাদেশের বড়ো জমিদারিগুলোর একটি ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র বার বছর তখন তিনি যশোর জেলার (বর্তমানে খুলনা জেলা) দক্ষিণডিহি গ্রামের পিরালি ব্রাহ্মণ রামনারায়ণ রায়চৌধুরীর কন্যা সারদা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই দক্ষিণডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী ওরফে মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ-সারদা দেবীর পনেরটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পনেরটি সন্তানের মধ্যে ছয় মেয়ে এবং নয় ছেলে। ছেলেদের নাম যথাক্রমে

১. দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬)
২. সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩)

---

৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১০৬

৩. হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪)
৪. বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫)
৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫)
৬. পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-১৯৫৭)
৭. সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২)
৮. রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)
৯. বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৮৬৪)

প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম বাঙালি আই সি এস। তিনি সরকারি চাকরিতে কর্মরত ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথকে উড়িষ্যার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিকৃত-মস্তিষ্ক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থিয়েটার গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এরপরেও তিনি পূর্ববঙ্গের জমিদারি তত্ত্বাবধান করেছেন, জাহাজের ব্যবসাও করেছেন। তবে স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ আত্মহত্যার ফলে তিনি অনেকটা ভেঙে পড়েছিলেন। ষষ্ঠপুত্র পুণ্যেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পরলোকগমন করেছিলেন। সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক। সর্বকনিষ্ঠ বুধেন্দ্রনাথ এক বছরের কম বেঁচে ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ?

পিতার নির্দেশে ১৮৯১ সালে বিরাহিমপুর, সাহাজাদপুর ও কালীগ্রাম—এই তিন পরগনার জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে আসেন। বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি শিলাইদহ থেকে অপর দু'টি পরগনা পরিচালিত হতো। ফলে জীবনের চতুর্থ দশক (১৮৯১-১৯০১) বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে বেশিরভাগ সময় শিলাইদহে অবস্থান করতে হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্যে তিনি প্রায়ই আসতেন অপর দুই পরগনার সদর কাছারি সাহাজাদপুর ও পতিসরে। রবীন্দ্রনাথের এই অঞ্চলে অবস্থানকালের প্রথম পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই সাহাজাদপুর জমিদারি মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি আরো একবার ভাগাভাগি হয়। বিরাহিমপুর পরগনা, যার সদর কাছারি শিলাইদহ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে পড়ে। আর কালীগ্রাম পরগনা, যার সদর কাছারি পতিসর রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। তবে এই দু'টি পরগনার এক-তৃতীয়াংশের ইজারাসূত্রে মালিক হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাগাভাগির পরে শিলাইদহের জমিদারি দেখাশোনা করতেন প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা প্রমথ চৌধুরি এবং পরে পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথ এই জমিদারি পরবর্তীকালে ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আর পতিসরের জমিদারি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তত্ত্বাবধান করতেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত কালীগ্রাম পরগনা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই কাছারির সর্বশেষ নায়েব ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। উল্লেখ্য যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের বড়োমেয়ে সৌদামিনী দেবীর (১৮৪৭-

১৯২০) স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহ, সাহাজাদপুর ও পতিসরের জমিদারি দেখাশোনা করতেন। জোড়াসাঁকোতে যেদিন রবীন্দ্রনাথের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলছিল, সারদাপ্রসাদ সেদিন শিলাইদহে মৃত্যুবরণ করেন।

বিয়ের মাত্র দু'দিন আগে (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৯০) পিতার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি পান। চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ পুত্রকে লিখেছেন, 'এই ক্ষণে তুমি জমিদারীর কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিত রূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশিল বাকী জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ।' এই চিঠি লেখার পর মহর্ষি ছয়বছর অপেক্ষা করেছেন। তাঁর কবিপুত্রকে এই ছয়বছর জমিদার হিসেবে গড়ে তুলে ১৮৮৯ সনের নভেম্বরে (১২৯৬ বঙ্গাব্দ, ১১ অগ্রহায়ণ) কলকাতা থেকে শিলাইদহে পাঠান। এ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী ছিলেন কবির স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং বলেন্দ্রনাথ। জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তিনি ঠিক কবে শিলাইদহ পৌঁছান তার সঠিক তারিখ রবীন্দ্রজীবনী থেকে পাওয়া যায় না। শিলাইদহ পৌঁছে অকুস্থলের বর্ণনা দিয়ে ইন্দিরা দেবীকে কবি একটি চিঠি লেখেন ১৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর)। এই চিঠি প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল* লিখেছেন, 'চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন সম্ভবত ১৪,১৫,১৬ ও অগ্রহায়ণ (২৮-৩০ নভেম্বর, ১৮৮৯) — এই তিনদিন ধরে।'

* প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ১, কলকাতা ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ৮